মুসলিম উম্মতের সর্বসাধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দার্‌স-সমূহ

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

মাননীয় শাইখ আব্দুল আযীয ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন বায

অনুবাদ : মুহাম্মদ রকীবুদ্দীন আহমদ হোসাইন

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2011-1432

IslamHouse.com

﴿ الدروس المهمة لعامة الأمة ﴾

« باللغة البنغالية »

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ترجمة: محمد رقيب الدين أحمد حسين

مراجعة: د. أبو بكر محمد زكريا

2011 - 1432

IslamHouse.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد!

এ পুস্তিকায় ইসলাম সম্পর্কে সর্বসাধারণের পক্ষে যে সব বিষয় অবগত হওয়া একান্ত অপরিহার্য সেগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো। পুস্তিকাটি “মুসলিম উম্মতের সর্বসাধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দারসসমূহ” শিরোনামে অভিহিত করে আল্লাহ্ তা‘আলার কাছে প্রার্থনা জানাই তিনি যেন এর দ্বারা মুসলিম ভাইদের উপকৃত করেন এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করে নেন। নিশ্চয় তিনি মহান দাতা অতি মেহেরবান।

আব্দুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ ইবন বায

প্রথম দরস

ইসলামের পাঁচ ভিত্তির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। তম্মধ্যে প্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হলো:

شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمد رسول الله

একথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।"

لا اله إلا الله এর শর্তাবলীর বর্ণনাসহ শাহাদাত বাক্যদ্বয়ের মর্মার্থ ব্যাখ্যা করা। 'লা-ইলাহা' দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করা হয়, তাদের সবাইকে অস্বীকার করা এবং 'ইল্লাল্লাহ' দ্বারা যাবতীয় এবাদত একমাত্র আল্লাহুর জন্য প্রতিষ্ঠিত করা, এতে তাঁর কোন শরীক নেই।

"লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ" এর শর্তাবলী হলো:

১. ইলম (জ্ঞান) : যা অজ্ঞতার পরিপন্থী, ২.ইয়াক্বীন (স্থির বিশ্বাস) যা সন্দেহের পরিপন্থী, ৩. ইখলাছ (নিষ্ঠা) যা শিরকের পরিপন্থী, ৪. সততা যা মিথ্যার পরিপন্থী, ৫. মাহাব্বাত (ভালবাসা) যা বিদ্বেষের পরিপন্থী, ৬. আনুগত্য যা অবাধ্যতা বা বর্জনের

পরিপন্থী, ৭. কবুল (গ্রহণ) যা প্রত্যাখ্যানের পরিপন্থী এবং ৮. আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত যারই ইবাদত করা হয় তার প্রতি কুফরী বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা।

এই শর্তগুলো নিম্নোক্ত আরবী কবিতার দুটি পংক্তির মধ্যে একত্রে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে:

علم يقين وإخلاص وصدقك مع   محبـة وانقيـاد والقبـول لها

وزيد ثامنها الكفران منك بما   سوى الإله من الأشياء قد أُلها

[অর্থ: এই কালেমা সম্পর্কে জ্ঞান, এর প্রতি স্থির বিশ্বাস, নিষ্ঠা, সততা, ভালবাসা, আনুগত্য ও এর মর্মার্থ গ্রহণ করা:এই সাথে আট নম্বরে যা যোগ করা হয়, তাহলো: আল্লাহ ব্যতীত যারা অনেক মানুষের কাছে উপাস্য হয়ে আছে তাদের প্রতি তোমার কুফরী অর্থাৎ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা।]

এই সাথে محمد رسول الله ("মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল") এই শাহাদাত বাক্যের অর্থ বিশ্লেষণ করা এই বাক্যের দাবি হলো: রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সব বার্তা বাহন করে নিয়ে এসেছেন সে বিষয়ে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, তিনি যেসব কাজের নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করা

এবং যা নিষেধ করেছেন বা যা থেকে বারণ করেছেন তা পরিহার করে চলা। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সব বিষয় প্রবর্তন করেছেন কেবল সেগুলোর মাধ্যমেই যাবতীয় ইবাদত সম্পাদন করা।

এরপর শিক্ষার্থর সম্মুখে ইসলামের পঞ্চ ভিত্তির অপর বিষয়গুলোর বিশদ বিবরণ তোলে ধরা: সেগুলো হলো: ২.নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, ৩. যাকাত প্রদান, ৪. রমজানের রোজা পালন, এবং ৫. সামর্থবান লোকের পক্ষে বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জব্রত পালন করা।

দ্বিতীয় দর্‌স

আরকানে ঈমান অর্থাৎ ঈমানের মৌলিক ছয়টি বিষয়।

সেগুলো হলো:

১- বিশ্বাস স্থাপন করা আল্লাহর তা'আলার উপর,

২- তাঁর ফেরেশতাগণ,

৩- তাঁর অবতীর্ণ কিতাবসমূহ,

৪- তাঁর প্রেরিত নবী-রাসূলগণ ও

৫- আখেরাতের দিনের উপর এবং

৬- বিশ্বাস স্থাপন করা ভাগ্যের উপর, যার ভালমন্দ সবকিছু আল্লাহ পাক হতেই নির্ধারিত হয়ে আছে।

তৃতীয় দর্‌স

তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ) তিন প্রকার । যথা:

(১) তাওহীদের রবুবিয়্যাহ (আল্লাহর প্রভূত্বে তাওহীদ)

(২)তাওহীদে উলুহীয়্যাহ (আল্লাহর ইবাদতে তাওহীদ)

(৩) তাওহীদে আসমা ও ছিফাত (আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে তাওহীদ)

১- প্রভূত্বে তাওহীদ : এর অর্থ এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহ পাকই সবকিছুর স্রষ্টা এবং সবকিছুর নিয়ন্ত্রনকারী তিনি, এতে তাঁর কোন শরীক নেই।

২- ইবাদতে তাওহীদ : এর অর্থ এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে আল্লাহ পাকই সত্যিকার মা'বুদ, এতে তাঁর কোন শরীক নেই। এটাই কালেমা 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহর মর্মার্থ। কেননা, এর প্রকৃত অর্থ হলো: আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার আর কোন মা'বুদ নেই। সবপ্রকার ইবাদত যেমন, নামায, রোজা ইত্যাদি একমাত্র আল্লাহরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত করা অপরিহার্য। কোন প্রকার ইবাদত অন্য কারো উদ্দেশ্যে নিবেদিত করা বৈধ নয়।

৩- নাম ও গুণাবলীতে তাওহীদ : এর অর্থ এই যে, কুরআন করীমে এবং বিশুদ্ধ হাদীসে আল্লাহ পাকের যেসব নাম ও গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। এগুলোকে আল্লাহ পাকের শানের উপযোগী পর্যায়ে এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করা যাতে কোন অপব্যখ্যা, নিষ্ক্রিয়তা, উপমা অথবা বিশেষ কোন ধরণ বা সাদৃশ্যপনার লেশ না থাকে। যেমন, আল্লাহ পাক বলেন:

﴿ قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۝٢ لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ ۝٣ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ ۝٤ ﴾ [الإخلاص:١-٤]

অর্থ : (হে রাসূল) " বল তিনিই আল্লাহ এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কারো জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি, আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।" (সূরা ইখলাছ)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ۝١١ ﴾ [الشورى:١١]

অর্থ: "তার মত কেউ নেই, তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।" (সুরা শূরা:১১)

কোন কোন আলেম তাওহীদকে দুই প্রকারে বিভক্ত করেছেন এবং নাম ও গুণাবলীর তাওহীদকে প্রভূত্বে তাওহীদের অন্তর্ভূক্ত করে ফেলেন। এতে কোন বাঁধা নেই, কেননা, উভয় ধরনের প্রকার বিন্যাশের উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট।

আর শিরক হলো তিন প্রকার যথা : (১) বড় শির্ক (২) ছোট শির্ক এবং (৩) সুক্ষ বা গুপ্ত শির্ক।

বড় শির্ক:

বড় শিরকের ফলে মানুষের আমল নষ্ট হয়ে যায় এবং তাকে জাহান্নামে চিরকাল থাকতে হয়। আল্লাহ পাক বলেন:

﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾ ﴾ [الأنعام:٨٨]

অর্থ: "এবং তারা যদি আল্লাহর সাথে শিরক করে তাহলে তাদের সব কার্যক্রম নিষ্ফল হয়ে যায়।" (সুরা আল-আন'আম:৮৮)

আল্লাহ পাক আরো বলেন:

﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا۟ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ شَٰهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ وَفِى ٱلنَّارِ هُمْ خَٰلِدُونَ ﴿١٧﴾ ﴾ [التوبة:١٧]

(১) অর্থ: “মুশরিকদের জন্য আল্লাহর ঘর মসজিদ সংস্থানের কোনই প্রয়োজন নেই। অথচ নিজেরা কুফুরীর সাক্ষ্য দিচ্ছে। ঐ সমস্ত লোকদের কৃতকর্ম সমূহ ধ্বংস করে দেয়া হবে এবং তারা চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে। (সূরা আত-তাওবাহ: ১৭)

এই প্রকার শিরকের উপর কারো মৃত্যু হলে তাকে কখনও ক্ষমা করা হবেনা এবং জান্নাত তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক বলেন:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ ﴾ [النساء:٤٨]

(২) অর্থ : “নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তা'আলা শিরকের গুনাহ ক্ষমা করেন না। ইহা ছাড়া যা ইচ্ছা ক্ষমা দিতে পারেন। (সূরা আন-নিসা: ৪৮)

আল্লাহ পাক আরও বলেন:

﴿ إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ ٧٢ ﴾ [المائدة:٧٢]

(৩) অর্থ: নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করে, তার জন্য বেহেশত হারাম হয়ে যায় এবং তার অবস্থান হয় জাহান্নামে।

অবশ্যই অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা আল-মায়িদাহ: ৭২)

এই প্রকার শিরকের আওতায় পড়ে মৃত লোক ও প্রতিমাসে ডেকে দু'আ করা তাদের আশ্রয় প্রার্থনা করা, তাদের উদ্দেশ্যে মান্নত ও জবাই করা ইত্যাদি।

ছোট শিরক:

ছোট শিরক বলতে, এমন কর্ম বুঝায় যাকে কুরআন বা হাদীসে শিরক বলে নামকরণ হয়েছে, তবে তা বড় শিরকের আওতায় পড়ে না। যেমন কোন কোন কাজে রিয়া বা কপঠতার আশ্রয় গ্রহণ, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করা, আল্লাহ এবং অমুক যা চাইছেন তা হয়েছে" বলা ইত্যাদি। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

« أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر »

"তোমাদের উপর যে বিষয়টির সবচেয়ে বেশী ভয় করি তা হলো ছোট শিরক" এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, সেটা হলো রিয়া অর্থাৎ কপঠতা। এই হাদীস ইমাম আহমদ, তাবারানী ও বায়হাকী মাহমূদ বিন

লবীদ আনছারী (রা) থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন। আর তাবারানী কতিপয় বিশুদ্ধ সনদে মাহমুদ বিন লবীদ থেকে, তিনি রাফে‘ বিন খুদাইজ থেকে বর্ণনা করেছেন। অপর এক হাদীসে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

« من حلف بشيء دون الله فقد أشرك »

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে শপথ করবে তার এই কাজ শিরক বলে গণ্য হবে।” ইমাম আহমদ বিশুদ্ধ সনদে উমর বিন খাত্তাব (রা) থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ দাউদ ও তিরমিজী আব্দুল্লাহ বিন উমর থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

« من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك »

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করলো সে আল্লাহর সাথে কুফুরী বা শিরক করলো”। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন:

«لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان»

“তোমরা এ কথা বল না যে আল্লাহ এবং অমুক যা চাইছেন তা-ই হয়েছে, বরং এভাবে বল ‘আল্লাহ যা চাইছেন এবং পরে অমুক যা চাইছেন তা-ই হয়েছে।” এই হাদীস আবূ দাউদ বিশুদ্ধ সনদে হুজায়ফা বিন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

এই প্রকার শিরক অর্থাৎ ছোট শিরকের কারনে বান্দাহ ধর্মত্যাগী হয়না বা ইসলাম থেকে সে বের হয়ে যায় না এবং জাহান্নামে সে চিরস্থায়ীও থাকবে না, বরং ইহা অপরিহার্য্য পূর্ণ তাওহীদের পরিপন্থী এক পাপ বিশেষ।

তৃতীয় প্রকার শিরক অর্থাৎ সুক্ষ্ম শিরক : এর প্রমাণ নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিম্নোক্ত হাদীস। তিনি বলেন:

«ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجّال؟» قالوا : بلى يا رسول الله، قال: «الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه»

হে সাহাবীগণ, আমি কি তোমাদের সেই বিষয়ের খবর দিব না যা আমার দৃষ্টিতে তোমাদের পক্ষে মসীহ দাজ্জাল থেকেও ভয়ঙ্কর? সাহাবীগণ উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, বলুন হে আল্লাহর রাসূল,

তখন তিনি বললেন, সেটা হলো সুক্ষ (গুপ্ত) শিরক, কোন কোন ব্যক্তি নামাজে দাড়িয়ে নিজের নামাজ সুন্দর করার চেষ্টা করে এই ভেবে যে অপর লোক তারঁ প্রতি তাকাচ্ছে।” ইমাম আহমদ তাঁর মাসনদে এই হাদীস আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

যাবতীয় শিরক মাত্র দুই প্রকারেও বিভক্ত করা যেতে পারে: ছোট শিরক এবং বড় শিরক।

সুক্ষ বা গুপ্ত শিরক ছোট এবং বড় উভয় প্রকার হতে পারে।

কখনও ইহা বড় শিরকের পর্যায়ে পড়ে: যেমন মুনাফিকদের শিরক যা বড় শিরক হিসেবে পরিগণিত। তারা নিজেদের ভ্রান্ত বিশ্বাস গোপন রেখে প্রাণের ভয়ে কপঠতা বা রিয়ার প্রশ্রয়ে ইসলামের ভান করে চলে।

এই ভাবে সুক্ষ শিরক ছোট শিরকের পর্যায়েও পড়তে পারে: যেমন, ‘রিয়া’ বা ‘কপঠতা’ যার উল্লেখ মাহমুদ বিন লবীদ আনছারী ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ে রয়েছে। আল্লাহই আমাদের তাওফীক দানকারী।

চতুর্থ দর্‌স

ইহসানের মূল ভিত্তি, আর তাহলো: তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যেন তুমি আল্লাহপাককে স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছ, আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও তাহলে তোমার এ বিশ্বাস নিয়ে ইবাদত করা যে তিনি তোমাকে দেখছেন।

পঞ্চম দরস

সূরা ফাতেহা এবং সূরা যাল্‌যালাহ থেকে সূরা 'নাস' পর্যন্ত ছোট ছোট সূরাসমূহের যতটা সম্ভব অধ্যয়ন, বিশুদ্ধ পঠন ও মুখস্থকরণ এবং এর মধ্যে যেসব বিষয়ের অনুধাবন অপরিহার্য সেগুলোর ব্যাখ্যা জানা।

ষষ্ঠ দরস

নামাজের শর্তাবলী, আর সেগুলো হলো নয়টি। যথা:

(১) ইসলাম (২) বুদ্ধিমত্তা (৩) ভাল-মন্দ পার্থক্যের জ্ঞান (৪) নাপাকি দুর করা (৫) অজু করা। (৬) সতরে আওরাত অর্থাৎ লজ্জাস্থানসহ শরীরের নির্ধারিত অংশ আবৃত রাখা (৭) নামাজের সময় উপস্থিত হওয়া (৮) কেবলামুখী হওয়া এবং (৯) নিয়ত করা।

সপ্তম দরস

নামাজের রুকুন চৌদ্দটি; যথা:

(১) সমর্থ হলে দণ্ডায়মান হওয়া, (২) ইহরামের তাকবীর, (৩) সূরা ফাতেহা পড়া, (৪) রুকুতে যাওয়া, (৫) রুকু হতে উঠে সোজা দণ্ডায়মান হওয়া, (৬) সপ্তাঙ্গের উপর ভর করে সিজদা করা, (৭) সিজদা থেকে উঠা, (৮) উভয় সিজদার মধ্যে বসা, (৯) নামাজের সকল কর্ম সম্পাদনে স্থিরতা অবলম্বন করা, (১০) সকল রুকুন ধারাবাহিকভাবে তরতীবের সাথে সম্পাদন করা, (১১) শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়া, (১২) তাশাহ্হুদ পড়া কালে বসা, (১৩) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর দরুদ পড়া (১৪) ডানে ওবামে দুই সালাম প্রদান।

অষ্টম দর্‌স

নামাজের ওয়াজিবসমূহ; এগুলোর সংখ্যা আট। যথা:

(১) ইহ্‌রামের তাকবীর ব্যতীত অন্যান্য তাকবীরগুলো

(২) ইমাম এবং একা নামাজীর পক্ষে سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه বলা।

(৩) সকলের পক্ষে رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد বলা

(৪) রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ বলা

(৫) সিজদায় سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى বলা।

(৬) উভয় সিজদার মধ্যে رَبِّ اغْفِرْ لِيْ বলা

(৭) প্রথম তাশাহ্‌হুদ পড়া

(৮) প্রথম তাশাহ্‌হুদ পড়ার জন্য বসা।

নবম দর্স

তাশাহ্হুদ অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাতু এর বর্ণনা। নামাজি নিম্নরূপ বলবে,

«اَلتَّحِيَّاتُ للهِ وَالصّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسّلاَمُ عَلَيْنَا وعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ»

উচ্চারণ: আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত তাইয়্যিবাতু, আস্সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নবিইয়ূ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আস্সালামু আলাইনা ওয়া আলা-ইবা-দিল্লাহিস সালেহীন। আশ্হাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ।

অর্থ: “যাবতীয় ইবাদত ও অর্চনা মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক সমস্তই আল্লাহর জন্য, হে নবী আপনার উপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাগনের উপরও শান্তি অবতীর্ণ হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মা‘বুদ নেই এবং আরো

সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

অত:পর নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর দরুদ ও বরকতের দু'আ পড়তে গিয়ে বলবে:

«اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْراهِيْمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدُ مَّجِيْدً. اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدُ مَّجِيْد».

উচ্চারণ: "আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলা আ-লী মুহাম্মদিন কামা ছাল্লাইকা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা-আ-লী ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিইয়্ ওয়া আলা আলী মুহাম্মদিন কামা বা-রাকতাআলা ইবরাহীমা ওয়া আলা-আ-লী ইবরাহীম ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

অর্থ: "হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর বংশধরগণের উপর রহমত নাযিল করো, যেমনটি করেছিলে ইব্‌রাহীম (আ) ও তাঁর রংশধরগণের উপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয় এবং বরকত নাযিল কর মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর তাঁর বংশধরগণের

উপর, যেমনটি নাজিল করেছিলে ইব্রাহীম (আ) ও তাঁর বংশধরগণের উপর, নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত।”

অত:পর নামাজি শেষ তাশাহ্হুদের পর আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে জাহান্নামের আজাব ও কবরের আজাব থেকে, জীবন-মৃত্যুর ফেতনা থেকে এবং মসীহ দাজ্জালের ফেতনা থেকে। তারপর আপন পছন্দমত আল্লাহর কাছে দু’আ করবে, বিশেষ করে নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত দু‘আ গুলো ব্যবহার করা সবোর্রত্তম। তন্মধ্যে একটি হল নিম্নরূপ:

«اَللهُمَّ أعِنِيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»

«اللهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ»

উচ্চারণ: “আল্লাহুম্মা আ-ইনী আলা-জিক্‌রিকা ওয়া শুক্‌রিকা ওয়া হুস্‌নি ইবাদাতিক। আল্লাহুম্মা ইন্নী জালাম্‌তু নাফসী জুলমান কাসীরাউ” ওয়ালা ইয়াগফিরুজ্‌জুনু-বা ইল্লা আন্‌তা ফাগফিরলী মাগফিরাতাম্ মিন ইন্‌দিকা ওয়ার হামনী ইন্নাকা আন্‌তাল গাফুরুর রাহীম।

অর্থ: হে আল্লাহ ! আমাকে তোমার জিকির, শুকরিয়া আদায় ও ভালভাবে তোমারই ইবাদত করার তাওফীক দাও। আর, হে আল্লাহ ! আমি আমার নিজের উপর অনেক বেশী যুলুম করেছি, আর তুমি ছাড়া গুনাহসমূহ মাফ করতে পারেনা, সুতরাং তুমি তোমার নিজ গুনে আমাকে মার্জনা করে দাও এবং আমার প্রতি রহম করো, তুমিতো মার্জনাকারী অতি দয়ালু"।

দশম দর্‌স

নামাজের সুন্নতসমূহ। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো:

(১) নামাজের শুরুতে প্রারম্ভিক দো‘আ বা তাস্‌বীহ পড়া;

যেমন : (ক)

«سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ»

অর্থ : হে আল্লাহ ! তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি তোমরা প্রশংসার সাথে। তোমরা নাম বরকতময়, তোমার মর্যাদা অতি সুউচ্চে এবং তুমি ছাড়া ইবাদতের সত্যিকার কোন উপাস্য নেই।

অথবা (খ)

«اَللهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْن خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ الْمُشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ، اللهُمَّ نَقِّنِيْ مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقِّىْ اَلثَّوْبِ الأَبْيَضُ مِنَ الدّنَسِ، اللهُمَّ اَغسِلْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ بَالثَّلجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ»

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমার এবং আমার পাপরাশির মধ্যে এমন দুরত্ব সৃষ্টি করে দাও যেমন তুমি পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে দুরত্ব সৃষ্টি করেছো। হে আল্লাহ ! তুমি আমাকে আমার পাপসমূহ থেকে এমন ভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে দাও, যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়। হে আল্লাহ্, তুমি আমাকে আমার পাপসমূহ থেকে পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও।”

এগুলো ব্যতীত হাদীছে ছাবেত যে কোন প্রারম্ভিক দু'আ পড়লেও চলবে। }

(২) দাড়ানো অবস্থায় ডান হাতের তালু বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর ধারণ করা।

(৩) অঙ্গুলিসমুহ সংযুক্ত ও সরল রেখে উভয় হাত উভয় কাঁধ বা কান বরাবর উত্তোলন করা এবং তা প্রথম তাকবীর বলার সময়, রুকুতে যাওয়ার এবং রুকু থেকে উঠার সময় এবং প্রথম তাশাহ্হুদ শেষে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়ানোর সময়।

(৪) রুকু এবং সিজদায় একাধিকবার তাসবীহ পড়া।

(৫) উভয় সিজদার মধ্যে বসে একাধিকবার মাগফিরাতের দু'আ পড়া।

(৬) রুকু অবস্থায় পিঠ বরাবর মাথা রাখা।

(৭) সিজদাবস্থায় বাহুদ্বয় বক্ষের উভয় পার্শ্ব হতে এবং পেট উরুদ্বয় হতে ব্যবধানে রাখা।

(৮) সিজদার সময় বাহুদ্বয় যমীন থেকে উপরে উঠায়ে রাখা।

(৯) প্রথম তাশাহ্হুদ পড়ার সময় ও সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে বাম পা বিছিয়ে উহার উপর বসা এবং ডান পা খাড়া করে রাখা।

(১০) শেষ তাশাহ্হুদে ‘তাওয়াররুক’ করে বসা। এর পদ্ধতি হলো, পাছার উপর বসে বাম পা ডান পার নীচে রেখে ডান পা খাড়া করে রাখা।

(১১) প্রথম ও দ্বিতীয় তাশাহুদে বসার শুরু থেকে তাশাহ্হুদ পড়ার শেষ পর্যন্ত শাহাদাত অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করা এবং দু‘আর সময় নাড়াচড়া করা।

(১২) প্রথম তাশাহ্হুদের সময় মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর পরিবার-পরিজন এবং ইব্রাহীম (আ) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর দরুদ ও বরকতের দু‘আ করা।

(১৩) শেষ তাশাহ্হুদে দু‘আ করা।

(১৪) ফজর, জুমআ’, উভয় ঈদ ও ইস্তেসক্কার নামাজে এবং মাগরিব ও এশার নামাজের প্রথম দুই রাকাআতে উচ্চঃস্বরে ক্বিরাত পড়া।

(১৫) জোহর ও আছরের নামাজে, মাগরিবের তৃতীয় রাকআ‘তে এবং ইশার শেষ দুই রাকআ‘তে চুপে চুপে ক্বিরাত পাড়া।

(১৬) সূরা ফাতেহার অতিরিক্ত কুরআন পড়া।

এই সাথে হাদীসে বর্ণিত অন্যান্য সুন্নাতগুলোর প্রতিও খেয়াল রাখতে হবে; যেমন : ইমাম, মুকতাদী ও একা নামাজীর পক্ষে রুকু থেকে উঠার পর (রাব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ) বলার সাথে অতিরিক্ত যা পড়া হয় তা ও সুন্নাত। এইভাবে রুকুতে অঙ্গুলিগুলো ফাঁক করে উভয় হাত হাঁটুর উপর রাখা সুন্নাত।

একাদশ দর্‌স

নামাজ বাতেল করে এমন বিষয় আটটি; যথা:

(১) জেনে-শুনে ইচ্ছাকৃত কথা বলা। না জানার কারণে বা ভূলে কথা বললে তাতে নামাজ বাতেল হয় না,

(২) হাসি, (৩) খাওয়া, (৪) পান করা, ৫) লজ্জাস্থানসহ নামাজে অবশ্যই আবৃত রাখতে হয় শরীরের এমন অংশ উন্মুক্ত হওয়া, (৬) কিবলার দিক হতে অন্যদিকে বেশী ফিরে যাওয়া, (৭) নামাজের মধ্যে পর পর অহেতুক কর্ম বেশী করা, (৮) অজু নষ্ট হওয়া।

দ্বাদশ দর্‌স

অজুর শর্ত মোট দশটি; যথা:

১- ইসলাম, ২-বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া, ৩-ভাল-মন্দ পার্থক্যের জ্ঞান, ৪- নিয়ত, ৫-এই নিয়ত অজু শেষ না হওয়া পর্যন্ত বজায় রাখা, ৬-অজু ওয়াজিব করে এমন কাজ বন্ধ করা, ৭-অজুর পূর্বে ইস্তেনজা অথবা ইস্তেজমার করা, ৮-পানির পবিত্রতা ও উহা ব্যবহারের বৈধতা, ৯-শরীরের চামড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছার প্রতিবন্ধকতা দূর করা, ১০- সর্বদা যার অজুবঙ্গ হয় তার পক্ষে নামাজের সময় উপস্তিত হওয়া।

ত্রয়োদশ দর্‌স

অজুর ফরজসমূহ; এগুলো মোট ছয়টি; যথা:

১. মুখ মন্ডল ধোঁত করা; নাকে পানি দিয়ে ঝাড়া ও কুলি করা এর অন্তর্ভূক্ত ২. কনুই পযর্ন্ত উভয় হাত ধৌত কর,

৩. সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করা, কান ও উহার অন্তর্ভুক্ত, ৪. অজুর কার্যাবলী পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা ও ৬. এগুলো পরপর সম্পাদন করা।

উল্লেখ থাকে যে মুখমণ্ডল, উভয় হাত ও পা তিনবার করে ধৌত করা মুস্তাহাব। এইভাবে কুল্লি করা ও নামে পানি দিয়ে ঝাড়া তিনবার মুস্তাহাব। ফরজ মাত্র একবারই। তবে, মাথামাসেহ একাধিকবার করা মুস্তাহাব নয়। এই ব্যাপারে কতিপয় ছহীহ হাদীস বর্ণিত আছে।

চতুর্থতম দর্‌স

অজু ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ: আর তা হলো মোট ছয়টা; যথা:

১. মুত্রনালী ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া,

২. দেহ থেকে স্পষ্ট অপবিত্র কোন পদার্থ নির্গত হওয়া,

৩. নিদ্রা বা অন্য কোন কারণে জ্ঞান হারা হওয়া,

৪. কোন আবরণ ব্যতীত সম্মুখ বা পিছনের দিক থেকে হাত দ্বারা লজ্জাস্থান স্পর্শ করা,

৫. উটের মাংস ভক্ষণ করা এবং

৬. ইসলাম পরিত্যাগ করা। আল্লাহ পাক আমাদের ও অন্যান্য সব মুসলমানদের এথেকে পানাহ দান করুন।

বিঃদ্রঃ মুর্দার গোসল দেওয়ার ব্যাপারে সঠিক মত হলো যে এতে অজু ভঙ্গ হয় না। অধিকাংশ আলেমগণের এই অভিমত। কারণ, অজু ভঙ্গের পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। তবে যদি গোসল দাতার হাত কোন আবরণ ব্যতিরেকে মুর্দার লজ্জাস্থানস্থান স্পর্শ করে তাহলে তার উপর অজু ওয়াজেব হয়ে যাবে। কোন আবরণ

ব্যতিরেকে মুর্দার লজ্জাস্থানে যাতে হাত স্পর্শ না করে তৎপ্রতি গোসল দাতার অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে।

এইরূপ স্ত্রীলোক স্পর্শে কোন ভাবেই অজু ভঙ্গ হয়না, তা কামভাব সহকারে হউক বা বিনা কামভাবে হউক। আলেমগণের সঠিক অভিমত এটাই। কোন কিছু বের না হলে অজু নষ্ট হয় না। এর প্রমাণ নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কোন কোন স্ত্রীকে চুমু খাওয়ার পর নামাজ পড়েছেন, অথচ পুনরায় অজু করেননি। উল্লেখযোগ্য যে, সূরা নিসা ও সূরা মায়েদার দুই আয়াতে যে স্পর্শের কথা বলা হয়েছে অথবা তোমরা স্ত্রীলোক স্পর্শ করা-তা সহবাসের অর্থে বলা হয়েছে। আলেমগণের সঠিক অভিমত তাই। ইবন আব্বাস সহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ধর্মীয় একদল আলেমেরও এই অভিমত। আল্লাহ পাকই আমাদের তাওফীক দাতা।

পঞ্চদশ দর্‌স

প্রত্যেক মুসলিমের পক্ষে ইসলামী চরিত্রে বিভূষিত হওয়া

ইসলামী চরিত্রের মধ্যে রয়েছে: সততা, বিশ্বস্থতা, নৈতিক ও চারিত্রিক পবিত্রতা, লজ্জা, সাহস, দানশীলতা, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক হারামকৃত বিষয় থেকে দূরে থাকা, প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার, সাধ্যমত অভাবগ্রস্থ লোকের সাহায্য করা এবং অন্যান্য সৎচরিত্রাবলী যেগুলোর বৈধতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও সুন্নায় প্রমাণ পাওয়া যায়।

ষষ্ঠদশ দর্‌স

ইসলামী আদব-কায়দায় শিষ্ঠাচার হওয়া। এর মধ্যে রয়েছে। সালম প্রদান, হাসিমুখে সাক্ষাৎ প্রদান, ডাক হাতে পানাহার করা, পানাহারের শুরুতে বিসমিল্লাহ এবং শেষে আল-হামদুলিল্লাহ বলা, হাঁচি দেয়ার পর 'আলহামদু লিল্লাহ' বলা এবং এর উত্তরে অপরজন কর্তৃক 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' (আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন) বলা। মসজিদে বা ঘরে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময়, সফরকালে, পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও ছোট-বড় সকলের সাথে ব্যবহার কালে শরীয়তের আদাবসমূহ পালন করে চলা, নবজাত শিশুর জন্মে অভিনন্দন জানানো, বিবাহ উপলক্ষে বরকতের দু'আ করা এবং বিপদে ও মুত্যুতে সান্তনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করাসহ বস্ত্র পরিধান ও উহা খোলা এবং জুতা ব্যবহারের সময় ইসলামী আদাব-কায়দা মেনে চলা

সপ্তদশ দর্স

শিরক ও বিভিন্ন প্রকার পাপ থেকে সতর্ক থাকা এবং অপরকে সতর্ক করা।

তন্মধ্যে সাতটি ধ্বংসকারী পাপ অন্যতম। এগুলো হলো:

১। আল্লাহর সাথে শিরক করা, ২। যাদু করা, ৩। অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা যা আল্লাহ পাক নিষিদ্ধ করে রেখেছেন, ৪। এতিমের সম্পদ অবৈধ পন্থায় ভক্ষণ করা, ৫। সুদ গ্রহণ করা, ৬। যুদ্ধের দিন ময়দান থেকে পৃষ্ট প্রদর্শন করে পালয়ন করা এবং সতী-সাধ্বী মুমিনা সরলমনা নারীদের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া।

বড় বড় পাপের মধ্যে আরও রয়েছে; যেমন: মাতাপিতার অবাধ্য হওয়া, রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা, মিথ্যা শপথ গ্রহণ করা, প্রতিবেশীকে যন্ত্রনা দেওয়া, রক্ত, সম্পদ ও মান-সম্মানের উপর জুলুম করা ইত্যাদি যা আল্লাহ পাক অথবা তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

অষ্টাদশ দর্স

মৃত ব্যাক্তির কাফন-দাফনের ব্যবস্থাপনা ও জানাযার নামাজ পড়া।

নিম্নে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

মৃত্যের অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া:

প্রথমত: কোন ব্যক্তির মৃত্যু আসন্ন হলে তাকে কালেমা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীস। তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের মৃতদেরকে "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু" শিক্ষা দাও।"-মুসলিম

এই হাদীসে মৃতদের বলতে ঐ সব মরণাপন্ন লোকদের কথা বলা হয়েছে যাদের উপর মৃত্যুর লক্ষণাদি স্পষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয়ত: কোন মুসলমানের মৃত্যু নিশ্চিত হলে তার চক্ষুদ্বয় মুদিত এবং দাড়ি বেঁধে রাখতে হয়।

তৃতীয়ত: মৃত মুসলমানের গোসল করানো ওয়াজিব। তবে যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যুর শহীদের গোসল করানো হয় না, না তাঁর উপর জানাজার নামাজ পড়া হয়; বরং তার পরিহিত বস্ত্রেই তাকে দাফন করা হয়। কেননা, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

উহুদের যুদ্ধে মৃতদের গোসল করাননি এবং তাদের উপর নামাজও পড়েননি।

চতুর্থত: মৃতের গোসল করানোর পদ্ধতি। গোসল করানোর সময় প্রথমে মৃত ব্যক্তিক লজ্জাস্থান আবৃত করে নিবে। তারপর তাকে একটু উঠিয়ে আস্তে আস্তে তার পেটের উপর চাপ দিবে। পরে গোসলদানকারী ব্যক্তি নিজের হাতে একটা নেকড়ে বা অনুরুপ কিছু পেছাইয়া নিবে যাতে মৃতের মলমুত্র থেকে নিজেকে রক্ষা করে নিতে পারে। তারপর মৃত ব্যক্তিকে সে নামাজের অজু করাবে এবং তার মাথা ও দাঁড়ি বরই পাতা বা অনুরূপ কিছুর পানি দিয়ে ধৌত করবে। অত:পর তার দেহের ডান পার্শ্ব, তারপর বাম পার্শ্ব ধৌত করবে। এইভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার ধৌত করবে। প্রতিবার হাত দিয়ে পেটের উপর চাপ দিবে। কিছু বের হলে তা ধৌত করে নিবে এবং তুলা বা অনুরূপ কিছু দিয়ে স্থানটি বন্ধ করে রাখবে। এতে যদি বন্ধ না হয় তাহলে পুড়ামাটি অথবা আধুনিক কোন ডাক্তারি পদ্ধতি অনুসারে যেমন প্লষ্টার বা অন্য কিছু দিয়ে বন্ধ করতে হবে এবং পুনরায় অজু করাবে। যদি তিনবারে পরিস্কার না হয় তাহলে পাঁচ থেকে সাতবার ধৌত করাবে। এরপর কাপড় দ্বারা শুকিয়ে নিবে এবং সিজদার অঙ্গ ও

অপ্রকাশ্য স্থানসমূহে সুগন্ধি লাগাবে। আর যদি সমস্ত শরীরে সুগন্ধি লাগানো যায় তাহলে আরো ভালো। এই সাথে তার কাফনগুলো ধুপ-ধুনা দিয়ে সুগন্ধি করে নিবে। যদি তার গোফ বা নখ লম্বা থাকে তা কেটে নিবে, তবে চুল বিন্যাস করবেনা। স্ত্রীলোক হলে তার চুল তিনগুচ্ছে বিভক্ত করে পিছনের দিকে ছেড়ে রাখবে।

পঞ্চমত: মৃত্যের কাফন:

সাদা বর্ণের তিনখানা কাপড়ে পুরুষের কাফন দেওয়া উত্তম। জামা বা পাগড়ী এর অন্তর্ভূক্ত নয়। এইভাবে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাফন দেয়া হয়েছিল। মৃতকে এর ভিতরে পর্যায়ক্রমে রাখা হয়। একটা জামা, একটা ইজার ও একটা লেফাফার দ্বারা কাফন দিলেও চলে। স্ত্রীলোকের কাফন পাঁচ টুকরা কাপড়ে দেওয়া হয়, সেগুলো হলো-চাদর, মুখবরণ, ইজার ও দুই লেফাফা। ছোট বালকের কাফন এক থেকে তিন কাপড়ের মধ্যে দেওয়া যায় এবং ছোট বালিকার কাফন এক জামা ও দুই লেফাফায় দেওয়া হয়। সকলের পক্ষে একখানা কাপড়ই ওয়াজেব যা মৃত্যের সম্পূর্ণ শরীর আবৃত করে রাখতে পারে। তবে মৃত ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় হলে তাকে বরই পাতার সিদ্ধ

পানি দিয়ে গোসল দিতে হয় এবং তাকে তার ইজার ও চাদর অথবা অন্য কাপড়ে কাফন দিলেও চলে। তবে তার মস্তক ও চেহারা আবৃত করা যাবে না বা তার কোন অঙ্গ সুগন্ধি ও লাগানো যাবে না। কেননা, ক্বিয়ামতের দিন সে তালবিয়া পাঠ করতে করতে উত্থিত হবে। এই সম্পর্কে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত আছে। আর যদি মুহরিম স্ত্রীলোক হয় তাহলে অন্যান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় তার কাফন হবে। তবে তার গায়ে সুগন্ধি লাগানো যাবেনা এবং নেকাব দিয়ে চেহারা বা মোজা দিয়ে তার হস্তদ্বয় কাফনের কাপড় দিয়েই আবৃত করা হবে। ইতিপূর্বে মেয়েলোকের কাফন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠমত: মৃত ব্যক্তি জীবদ্দশায় যাকে অছিয়ত করে যাবে সেই হবে তার গোসল, দাফন করা ও তার উপর জানাযার নামাজ পড়ার অধিকতর হকদার। তারপর তার পিতা, তারপর তার পিতামহ, তারপর তার বংশে অধিকতর ঘনিষ্ট লোকের হক হবে। এইভাবে স্ত্রীলোক যাকে অছিয়ত করবে সেই হবে উপরোক্ত কাজগুলো সম্পাদনের অধিকতর হকদার। তারপর তার মাতা, তারপর দাদী, তারপর পর্যায়ক্রমে বংশের অধিকতর ঘনিষ্ট

মেয়েরা হবে। স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে একে অপরের গোসল দিতে পারে। আবূ বকর সিদ্দিক রাজিয়াআল্লাহু আনহুকে তাঁর স্ত্রী গোসল দিয়েছিলেন এবং আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু তাঁর স্ত্রী হযরত ফাতিমা রাজিয়াল্লাহু আনহাকে গোসল দিয়েছিলেন।

সপ্তমত:

মৃতের উপর নামাজ পড়ার পদ্ধতি: (জানাযার নামাজ) জানাযার নামাজে চার তাকবীর দেওয়া হয়। প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতেহা পড়া হয়। এর সাথে যদি ছোট কোন সূরা বা দু এক আয়াত কুরআন শরীফ পড়া হয় তা হলে ভাল। কারণ, এই সম্পর্কে ইবন আব্বাস (রাজিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ছহীহ হাদীস বর্ণিত আছে। এরপর দ্বিতীয় তাকবীর দেওয়া হলে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর সে দরূদ পড়তে হয় যা নামাজে তাশাহুদের (আত্তাহিয়্যাতুর) সাথে পড়া হয়। তারপর তৃতীয় তাকবীর দিয়ে নিম্নলিখিত দু‘আ করা হয়:

«اَللهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا ، وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا، وَغَائِبِنَا، وَصَغِيْرِنَا وَ كَبِيْرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا. اللهُمَّ مَنْ أَحيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيْمَان- اَللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْنَ، وَعَافِه وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَّى الثَّوْبُ

الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ الْجَنَّةَ - وَأَعِذْهُ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ [وَعَذَابِ النَّارِ] وَأَفْصِحْ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ- اللهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلا تُضِلْنَا بَعْدَه»

উচ্চারণ: “আল্লাহুম্মাগফিরলী হাইয়্যিনা ওয়া মাইয়্যিতিনা ওয়া শাহিদীনা ওয়া গাইবিনাওয়া সাগিরীনা ওয়াকাবিরিনা ওয়া জাকারিনা ওয়া উনছা-না। আল্লাহুম্মা মান আহইয়াইতাহু মিন্না ফা আহয়্যিহী-আলাল ইসলাম, ওয়ামান তাওয়াফ্ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্ফাহু আলাল ঈমান। আল্লাহুম্মাগফিরলাহু ওয়ারহামহু, ওয়া আফিহি, ওয়া আ’ফু আনহু ওয়া আকরিম নুযুলাহুওয়াছ্ছি’ মুদকালাহু, ওয়া আগছিলহু বিলমা-ঈ ওয়াস্ সালজি ওয়াল বারদি। ওয়া নাক্কিহি মিনাল খাতয়া কামা য়ূনাক্কাস্ সাওবুল আবইয়াদু মিনাদ্দানাছি, ওয়া আবদিলহু দারান কাইরাম্ মিন্ দারিহী ওয়া আহলান কাইরাম্ মিন আহলিহী, ওয়া যাওজান কায়রাম মিন্ যাওজিহি, ওয়া আদখিলহুল জান্নাতা, ওয়া আইজহু মিন আযাবিল ক্বাবরি (ওয়া আযাবিন্নারি), ওয়া আফসিহ লাহু ফি ক্বাবরিহি ওয়া নাওয়ীর লাহু ফিহি, আল্লাহুম্মা লা তুহরিম না ওয়া জরাহু তুজিল্লানা বা’দাহু।”

অর্থ: “ হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত, ও অনুপস্থিত, ছোট, ও বড়, নর ও নারীদিগকে ক্ষমা করো, হে আল্লাহ ! আমাদের মাঝে যাদের তুমি জীবিত রেখেছো তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখো, আর যাদেরকে মৃত্যু দান করো তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করো। হে আল্লাহ ! তুমি এই মৃত্যুকে ক্ষমা করো, তার উপর রহম করো, তাকে পূর্ণ নিরাপত্তায় রাখো, তাকে মার্জনা করো, মার্যাদার সাথে তার আতিথেয়তা করো। তার বাসস্থানটি প্রশস্থ করে দাও, তুমি তাকে ধৌত করে দাও, পানি বরফ ও শিশির দিয়ে, তুমি তাকে গুনাহ হতে এমনভাবে পরিস্কার করো যেমন সাদা কাপড় ধৌত করে ময়ল বিমুক্ত করা হয়। তার এই (দুনিয়ার) বাসস্থানের বদলে উত্তম বাসস্থান প্রদান করো, তার এই পরিবার হতে উত্তম পরিবার দান করো, তার এই স্ত্রী হতে উত্তম স্ত্রী দান কর, তুমি তাকে বেহেস্তে প্রবেশ করাও, আর তাকে কবরের আযাব এবং দোযখের আযাব হতে বাঁচাও। তার কবর প্রশস্ত করে দাও এবং দোযখের আযাব হতে বাঁচাও। তার কবর প্রশস্ত করে দাও এবং তার জন্য ইহা আলোকময় করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তার সওয়াব হতে বঞ্চিত করোনা এবং তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করো না।

অত:পর চতুর্থ তাকবীর দিয়ে ডান দিকে এক সালামের মাধ্যমে নামাজ শেষ করা হয়।

জানাযার নামাজে প্রত্যেক তাকবীরের সাথে হাত উঠানো মুস্তাহাব। যদি মৃত ব্যক্তি পুরুষ হয় তাহলে...اَللهُمَّ اغْفِرْلَهُ الخ এর পরিবর্তে اَللهُمَّ اغْفِرْلَهَا... অর্থাৎ আরবী স্ত্রীলিঙ্গের সর্বনাম যোগ করে পড়তে হয়। আর যদি মৃত্যের সংখ্যা দুই হয় তাহলে اَللهُمَّ اغْفِرْلَهُمَا ..الخ এবং এর বেশী হলে اَللهُمَّ اغْفِرْلَهُمْ .... الخ অর্থাৎ সংখ্যা হিসেবে সর্বনাম ব্যবহার করতে হয়।

মৃত যদি শিশু হয় তাহলে উপরোক্ত মাগফিরাতের দু'আর পরিবর্তে এই দোয়া পড়া হবে:

«اللهُمَّ اجْعَلْهُ فَرْطًا وَّذُخْرًا لِوَالِدَيْهِ . وَشَفِيْعًا مُجَابًا . اللهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِيْنَهُمَا وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُوْرَهُمَا. وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاجْعَلْهُ فِيْ كِفَالَةِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ . وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيْمِ»

উচ্চারণ: "আল্লাহুম্মাজ্ আলহু ফারাতান ওয়া জুখরান লিওয়ালিদাইহি, ওয়া শাফীআন মুাবা। আল্লাহুম্মা ছাক্কিলবিহী মাওয়াযীনাহুমা- ওয়া আ'জিম বিহী উজু-রাহুমা-, ওয়া আলহিকুহু

বিসা-লিহিল মু'মিনীন ওয়া আজআলহু ফী কিফা- লাতি ইব্রাহিমা আলাইহিস সলাম, ওয়াক্বিহী বিরাহমাতিকা আযাবাল জাহীম।"

অর্থ: " হে আল্লাহ ! এই বাচ্ছাকে তার পিতা-মাতার জন্য " ফারাত" (অগ্রবর্তী নেকী) ও "যুখর" (সযত্নে রক্ষিত সম্পদ) হিসাবে কবুল করো এবং তাকে এমন সুপারিশকারী বানাও যার সুপারিশ কবুল করা হয়। হে আল্লাহ ! এই (বাচ্চার) দ্বারা তার পিতা-মাতার সওয়াবের ওজন আরো ভারী করে দাও এবং এর দ্বারা তাদের নেকী আরো বড় করে দাও। আর একে নেক্‌কার মু'মিনদের অন্তর্ভূক্ত করে দাও এবং ইব্‌রাহীম (আ) এর যিম্মায় রাখো, একে তোমার রহমতের দ্বারা দোযখের আযাব হতে বাঁচাও।"

সুন্নাত হলো ইমাম মৃত পুরুষের মাথা বরাবর দাড়াবে এবং স্ত্রীলোক হলে তার দেহের মধ্যমাংশে বরাবর দাঁড়াবে।

মৃত্যের সংখ্যা একাধিক হলে পুরুষের মৃতদেহ ইমামের নিকটবর্তী থাকবে এবং স্ত্রীলোকের মৃতদেহ কিবলার নিকটবর্তী থাকবে। তাদের সাথে বালক-বালিকা হলে পুরুষের পর স্ত্রীলোকের আগে বালক স্থান পাবে, তারপর স্ত্রীলোক এবং সর্বশেষে বালিকার স্থান হবে। বালকের মাথা পুরুষের মাথা

বরাবর এবং স্ত্রীলোকের মধ্যমাংশ পুরুষের মাথা বরাবর রাখা হবে। এইভাবে বালিকার মাথা স্ত্রীলোকের মাথা বরাবর এবং বালিকার মধ্যমাংশ পুরুষের মাথা বরাবর রাখা হবে। সব মুছাল্লীগণ ইমামের পিছনে দাঁড়াবে। তবে যদি কোন লোক ইমামের পিছনে দাঁড়াবার স্থান না পায় তাহলে সে ইমামের ডান পার্শ্বে দাঁড়াতে পারে।

অষ্টমত: মৃতের দাফন প্রক্রিয়া:

শরীয়ত মতে কবর একজন পরুষের মধ্যভাগ পরিমাণ গভীর এবং কেবলার দিক দিয়ে লহদ (বগলী কবর) আকারে করতে হবে। মৃতকে তার ডান পার্শ্বের উপর সামান্য কাত করে লাহাদে শায়িত করবে। তারপর কাফনের গাঁইট খুলে দিবে, তবে কাপড় খুলবে না, বরং এইভাবেই ছেড়ে দিবে। মৃত ব্যক্তি পুরুষ হোক আর নারী হোক কবরে রাখার পর তার চেহারা উন্মোক্ত করা যাবেনা। এরপর ইট কাড়া করে সেগুলো কাদা দিয়ে জমাট করে রাখবে, যাতে ইটগুলো স্থির থাকে এবং মৃতকে পতিত মাটি থেকে রক্ষা করে।

যদি ইট না পাওয়া যায় তাহলে অন্য কিছূ যেমন, তক্তা, পাথর খণ্ড অথবা কাঠ মৃতের উপর খাড়া করে রাকবে যাতে মাটি থেকে

তাকে রক্ষা করে। তারপর এর উপর মাটি ফেলা হবে এবং এই মাটি ফেলার সময়:

«بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ»

(আল্লাহর নামে এবং রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দ্বীনের উপর রাখলাম) বলা মুস্তাহাব। কবর এক বিঘত পরিমাণ উচু করবে এবং এর উপরে সম্ভব হলে ক ঙ্কর রেকে পানি ছিটিয়ে দিবে।

মৃতের দাফন করতে যারা শরীক হবে তাদের পক্ষে কবরের পার্শ্বে দাড়িয়ে মৃতের জন্য দু'আ করার বৈধতা রয়েছে। এর প্রমাণ, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন দাফন কাজ শেষ করতেন তখন তিনি কবরের পার্শে দাড়াতেন এবং লোকদের বলতেন "তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য মাগফিরাতে কামনা কর এবং ঈমানের উপর ছাবেত থাকার জন্য দু'আ কর; কেননা, এখনই তার সওয়াল-জওয়াব শুরু হচ্ছে।"

নবমমত: দাফনের পূর্বে যে মৃত্যের উপর নামাজ পড়ে নাই সে দাফনের পর নামাজ পড়তে পারে। কেনন, নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা করেছেন। তবে এই নামাজ

একমাস সময়ের মধ্যে হতে হবে, এর বেশী হলে কবরের উপর নামাজ পড়া বৈধ হবে না। কেনন, দাফনের একমাস পর রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন মৃতের উপর নামাজ পড়েছেন এমন কোন হাদীস পাওয়া যায় নাই।

দশম: উপস্থিত লোকদের জন্য মৃত্যের পরিবার-পরিজনের পক্ষে খাদ্য প্রস্তুত করা জায়েজ নয়। প্রসিদ্ধ সাহাবী হজরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ আল-বাজালী (রা) বলেন: "মৃত্যের পরিবার-পরিজনের নিকট সমবেত হওয়া এবং দাফনের পর খাদ্য প্রস্তুত করাকে আমরা মৃত্যের উপর 'নিয়াহা' (বিলাপ) বলে গণ্য করতাম।" (এই হাদীস ইমাম আহমদ উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন।) তবে মৃতের পরিবার-পরিজনের জন্য বা তাদের মেহমানদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করতে আপত্তি নেই। এভাবে তাদের জন্য মৃত্যের আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের পক্ষ থেকে খাদ্য সরবাহ করা জায়েজ আছে। এর প্রমাণ, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে যখন হযরত জাফর বিন আবূ তালিব (রাঃ) এর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি স্বীয় পরিবারবর্গকে বললেন: "জাফর পরিবারের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে

পাঠাও।” আরো বললেন যে, “তাদের উপর এমন মুছিবত নেমে আসছে যা তাদেরকে খাদ্য প্রস্তুত থেকে বিরত করে ফেলেছে।”

মৃত্যের পরিবার-পরিজনের জন্য যে খাদ্য পাঠানো হয় তা খাওয়ার জন্য প্রতিবেশীদের বা অন্যদের আহবান করা বৈধ। এর জন্য কোন নির্দিষ্ট সময়-সীমা আছে বলে আমাদের জানা নেই।

একাদশ: কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামী ব্যতীত অপর কোন মৃত্যের উপর তিন দিনের বেশী শোক প্রকাশ জায়েজ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীর উপর চারমাস দশ দিন পর্যন্ত শোক প্রকাশ ওয়াজিব। তবে গর্ভবর্তী হলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত শোক প্রকাশ ওয়াজিব। তবে গর্ভবর্তী হলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত শোক পালন করতে হয়। এই সম্পর্কে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীস আছে।

পুরুষের পক্ষে কোন মৃত্যের উপর সে আত্মীয় হোক আর অনাত্মীয় হোক শোক পালন জায়েজ নয়।

দ্বাদশ: সময়ে সময়ে পুরুষদের পক্ষে কবর জিয়ারত করা সুন্নাত এবং এর উদ্দেশ্য হবে মৃতদের জন্য দু’আ, রহমাত কামনা, মরণ এবং মরনোত্তর অবস্থা স্মরণ করা। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “তোমরা কবর জিয়ারত কর, কেননা, উহা তোমাদের আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে” (মুসলিম) রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবীগণকে শিক্ষা দিয়ে বলতেন যে, তারা যখন কবর জিয়ারতে যাবে তখন যেন বলে:

«اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهَ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ، نَسَأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيْةَ، يَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ وَالْمُسْتَأَخِرِيْنَ»

উচ্চারণ: “আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাদ্ দিয়ারি মিনাল মু’মিনীন ওয়াল মুসলিমীন, ওয়া ইন্না ইন্‌শা আল্লাহু বিকুম লাহকুন। নাসআলুল্লাহা লানা ওয়া লাকুমুল আফিয়াহ, ইয়ার হামুল্লাহুল্ মুস্‌তাকদিমীনা ওয়াল মুস্‌তাখিরীন।”

অর্থ: “তোমাদের প্রতি সালাম হোক হে কবরবাসী মু’মিন-মসলমানগণ, ইনশা আল্লাহ আমরাও অবশ্যই তোমাদের সাথে মিলিত হচ্ছি, আমরা আমাদের এবং তোমাদের সবার জন্য আল্লাহর নিকট শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করিছি। আল্লাহ অগ্রগামী পশ্চাতগামী আমাদের সবার প্রতি দয়া করুন।”

মেয়ে লোকের পক্ষে কবর জিয়ারত বৈধ নহে। কেনন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর জিয়ারতকারীনী নারীদের অভিশাপ করেছেন। এতদ্ব্যতীত মেয়েদের কবর জিয়ারতে ফেতনা ও অধৈর্য সৃষ্টির ভয় রয়েছে। এইভাবে মেয়েদের পক্ষে কবর পর্যন্ত জানাযার অনুগমন করা বৈধ নহে। কেননা, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে এথেকে বারণ করেছেন। তবে মসজিদে বা অন্য কেন স্থানে মৃত্যের উপর জানাযার নামাজ পড়া নারী পুরুষ সকলের জন্য বৈধ।

সাধ্যমত দরস সমূহ সংকলনের কাজ এখানেই সমাপ্ত হলো। আল্লাহ পাক আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সাহাবীগনের উপর দরুদ ও সালাম বর্ষন করুন।

والحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه.